সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

মালিকা সেন

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

১৯১৪ থেকে ১৯১৮-র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল স্মৃতি কাটতে না কাটতেই ১৯৩৯ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব, নৃশংসতার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই উদ্যোগেরই ফসল ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। ততদিনে বৃহৎ শক্তিগুলি দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, আণবিক শক্তির প্রয়োগের মর্মান্তিক ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতে যে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও ক্রমশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে উদ্যোগী এবং সফল হবে, এই আশঙ্কা থেকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর এবং বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে লিগ অফ নেশনসের ব্যর্থতার কারণে সামগ্রিক উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো শহরে জাতিপুঞ্জের আনুষ্ঠানিক উৎপত্তি হয়।

বিশ্বযুদ্ধের ফলে কীভাবে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, সেই স্মৃতি থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা, আণবিক শক্তির প্রয়োগ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির নাগরিকদের ভিটেমাটি হারানো, শরণার্থী শিবিরে উদ্‌বাস্তুদের লাগাতার জমায়েতের ঘটনাগুলিকে মাথায় রেখে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫-এ জন্ম নেওয়া জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো বিশ্বযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না হয়, আর কোনো কারণে যাতে বিশ্বব্যাপী সাধারণ

মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮-এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের সূচনা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র মানবাধিকার আন্দোলনের একটা চূড়ান্ত মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। প্যারিস শহরে সাধারণ সভার (২১৭ক) (Resolution) অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকারকে সর্বজনীন মৌলিক অধিকার এবং বিশ্বব্যাপী তার সংরক্ষণকে আন্তর্জাতিক সিলমোহর দেওয়া হয়।

জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি, আইনের অনুশাসন বা Rule of Law দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সংরক্ষণ, মানব শান্তি, লিঙ্গ ব্যতিরেকে পুরুষ-মহিলার সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রতি নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রদের মধ্যে মানবাধিকার রক্ষা এবং সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের এই মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সনদের—

১ নং ধারায় বলা হয়েছে, জন্মসূত্রেই সমস্ত মানুষ সমান, স্বাধীন এবং প্রত্যেক মানুষেরই জন্মসূত্রে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

২ নং ধারায় বলা হয়েছে, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক উৎস, সম্পত্তি নির্বিশেষে কারুর প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

৩ নং ধারায় সকলের জীবন বা বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪ নং ধারায় সব ধরনের দাসত্ব কিংবা দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৫ নং ধারায় নিষ্ঠুর, অমানবিক শাস্তি বা নির্যাতনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬ নং ধারায় মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৭ নং ধারায় আইনের চোখে সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সঙ্গে প্রত্যেকে যাতে আইন দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হতে পারে, সে কথাও বলা হয়েছে।

৮ নং ধারায় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদালতের বিচার বিভাগে প্রতিকার লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৯ নং ধারায় কাউকে যাতে বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসিত না করা হয়, সে কথা বলা হয়েছে।

১০ নং ধারায় স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার উল্লিখিত হয়েছে।

১১ নং ধারায় যে কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার আছে।

১২ নং ধারায় সকল ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার দেওয়া হয়েছে। গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বেআইনি হস্তক্ষেপ মান্য করা যাবে না।

১৩ নং ধারায় দেশের সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে যাতায়াত এবং বসবাস করার অধিকার সকলের আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশ বা অন্য দেশ ছাড়ার এবং পুনরায় ফিরে আসার অধিকার আছে।

১৪ নং ধারায়, নিজ দেশে নিপীড়নের আশঙ্কা থাকলে অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার আছে। বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন বা আফগানিস্তানের সমাজকর্মী ইউসুফ মালায়লার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

১৫ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয়তা লাভের অধিকার আছে। বলপূর্বক বা বেআইনি হস্তক্ষেপ করে কাউকে nationality বা জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৬ নং ধারায় দেশের পুরুষ ও মহিলা বিবাহযোগ্য হওয়ার নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করলে জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা নির্বিশেষে বিয়ে করার এবং পরিবার গঠনের অধিকার অর্জন করে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবিদার। বিবাহ তখনই সম্ভব যখন উভয়পক্ষই তাতে সম্মত এবং পরিবারকে স্বাভাবিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের।

১৭ নং ধারায় সকলকে নিজ সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার এবং যাতে বেআইনিভাবে সেই অধিকারকে ভঙ্গ করা না যায় সেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

১৮ নং ধারায় প্রত্যেকের চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এই অধিকার বলে যে কেউ তার সনাতন ধর্ম, বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে। এবং স্বাধীনভাবে যাতে ধর্মাচার, ধর্মপালন সকলে করতে পারে, সে কথা বলা হয়েছে।

১৯ নং ধারায় সকলের মতামত এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা উল্লিখিত হয়েছে। কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে তার মতামত এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে, তা বলা হয়েছে।

২০ নং ধারায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে, তবে কাউকে বলপূর্বক কোনো সংগঠনের সদস্য করা যাবে না।

২১ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের তার দেশে সরকারি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে। মানুষের সম্মতিই হল সরকারের কর্তৃত্বের উৎস। এবং সর্বজনীন সঠিক ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে।

২২ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে এবং জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রয়োগ এবং নিজের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের মর্যাদা রক্ষিত হবে।

২৩ নং ধারায় শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করার অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, কোনো বৈষম্য ছাড়া সম কাজের জন্য সম বেতনের কথা এবং কাজের অধিকার, কাজের উপযুক্ত পরিবেশের কথা বলা হয়েছে।

২৪ নং ধারায় সকলের কাজের থেকে বিশ্রাম এবং নির্দিষ্ট কাজের সময় এবং নির্দিষ্ট ব্যবধানে সবেতন ছুটির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

২৫ নং ধারায় প্রত্যেকের জন্য জীবনধারণের উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের কথা বলা হয়েছে। অসুস্থতা, বার্ধক্য, বৈধব্য বা অন্যান্য অসুবিধার সময় যাতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়, তাও বলা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা, শিশুদের নিরাপত্তার কথাও ২৫ নং ধারায় উল্লেখিত হয়েছে।

২৬ নং ধারায় সকলের শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিনামূল্যে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে সহনশীলতা, বন্ধুত্ব যাতে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে যাতে জাতিপুঞ্জের বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্য পূরিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৭ নং ধারায় জনসমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে সকলের অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।

২৮ নং ধারায় প্রত্যেকে এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে সে তার অধিকার ও তার স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করবে।

সনদের ২৯ নং ধারা অনুযায়ী, সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। প্রত্যেকের অধিকার ও স্বাধীনতা যেন

আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে সেগুলি যেন একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জনশৃঙ্খলার প্রয়োজন পূরণ এবং অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সাযুজ্য পূর্ণ হয়। এই সব অধিকার ও স্বাধীনতা যেন কোনোভাবেই রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতির বিরোধী না হয়।

৩০ নং ধারা অনুযায়ী, এই ঘোষণার কোনো কিছু কোনো রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অধিকার বা স্বাধীনতাকে ধ্বংস করবে না।

১৯৪৮-এর জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার ঘোষণা মানব ইতিহাসে গণতন্ত্র এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ঘোষণাপত্রে তিরিশটি মানবাধিকার থাকলেও বাস্তবে নানাবিধ অন্তরায়ের জন্য মানবাধিকারের সফল সার্বিক প্রয়োগ একটি অসম্পূর্ণ উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

দারিদ্র্য, বিশ্বব্যাপী অসাম্য, সশস্ত্র, সংঘাত, হিংসা, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, গণতান্ত্রিক কাঠামোর দুর্বলতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ, উদ্‌বাস্তু-শরণার্থী শিবিরের সমস্যা প্রভৃতি কারণে মানবাধিকারের সফল প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

অতিসম্প্রতি বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি, তার কারণে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য মানবাধিকারের সফল রূপায়ণে আরও বেশি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা আক্রান্ত রুগীদের অক্সিজেন পাওয়ার বিপুল চাহিদা তাদের মূল মানবাধিকারকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছে। কোভিড অতিমারির মধ্যে গণ-সৎকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরেকটি উদাহরণ।

এছাড়া ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, অর্থনীতির বেলাগাম অসাম্য, সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ, শরণার্থী বা রোহিঙ্গা উদ্‌বাস্তুদের চরম দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং অতি সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় তালিবানি শাসনের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা সাম্প্রতিক কালের বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরেকটি উদাহরণ।

এর পাশাপাশি খাদ্যসংকট, জলসংকট, পরিবেশ দূষণের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মানবাধিকার বাস্তবায়ন একটি অসমাপ্ত উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের Human Rights Council (HRC), যার সদস্য বিশ্বের সাতচল্লিশটি দেশ, যতদিন না সর্বসম্মতভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত মেটাতে পারছে এবং মানবাধিকার প্রয়োগে সঠিক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারছে, ততদিন অবধি মানবাধিকারের প্রয়োগ একটি অসফল প্রচেষ্টাই রয়ে যাবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকারকে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, এই ভাবনা থেকে ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে তিপ্পান্নটি সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়ে জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন তৈরি হয়। ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র, বড়ো বা ছোটো, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, মানবাধিকার কর্মীরা এই কমিশনকে একটি ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি করা যায়।

জেনেভাতে বার্ষিক সম্মেলনে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং কমিশন একশোরও বেশি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বজনীন পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

২০০৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের বদলে United Nations Human Rights Council-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ২০০৬ সালের ১৫ মার্চ জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে বিপুল ভোটে United Nations Human Rights Council (UNHRC) বা জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, গোটা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং প্রয়োগ। এই পরিষদের সদস্য সাতচল্লিশটি রাষ্ট্র। এই প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর হল সুইজারল্যান্ডের জেনেভা।

বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তর থেকে তিন বছরের জন্য সদস্যরা নির্বাচিত হন। এই মুহূর্তে যেমন আফ্রিকার ১৩টি রাষ্ট্র, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ১৩টি রাষ্ট্র, পূর্ব ইউরোপের ৬টি রাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকার ৮টি রাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে ৭টি রাষ্ট্র— সর্বমোট ৪৭টি রাষ্ট্র এই পরিষদের সদস্য।

২০১৬ সালে পরিষদের প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই পরিষদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো সদস্য রাষ্ট্রের অভিযোগ, তার প্রতিকার, সমবেত হওয়ার এবং সমিতি গঠনের অধিকার, মহিলার অধিকার রক্ষা, LGBT অধিকার রক্ষার মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলি যাতে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় পরিষদের মাধ্যমে। গোটা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষাই হল এই পরিষদের প্রধান অগ্রাধিকার।

ভিয়েনা ঘোষণা

মানবাধিকার আলোচনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হল ভিয়েনা ঘোষণা। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮)-র পঁয়তাল্লিশ বছর পরে (১৯৯৩) অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ১৪ থেকে ২৫ জুন যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা ভিয়েনা সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে ১৭১টি দেশের ৭০০ জন প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সকল প্রতিনিধিদের সম্মতির ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালের ২৫ জুন ভিয়েনা ঘোষণা এবং কর্মপন্থার কর্মসূচি ঘোষিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ৪৮তম অধিবেশনে ৪৮/১২১, ১৯৯৩ রেজোলিউশনের মাধ্যমে ভিয়েনা ঘোষণাকে অনুমোদন দেয়।

ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মপন্থা কর্মসূচিতে একটি প্রস্তাবনা সহ ১০০টি ধারা রয়েছে। ঘোষণাটি পার্ট-১ ও পার্ট-২— এই দুই অংশে বিভক্ত। প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকারের বিষয় রূপে বিবেচিত হয়। মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবনায়। প্রাথমিকভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব বর্তায়, সেই বিষয়ে সচেতন থাকার কথা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অংশে ৩৯টি ধারা আছে। এই ধারাগুলির মাধ্যমে মূলত মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা সহ মানবাধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের অধিকার সহ বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের স্বাধীনতা ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে মোট ১০০টি ধারা রয়েছে। এই ধারাগুলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত—

ক) ১ থেকে ৮ নং ধারায় মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় সমন্বয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কথা (সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ থেকে ১২ নং ধারা— সম্পদ— এখানে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার ব্যাপারে আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদের জোগান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩ থেকে ১৬ নং ধারা— মানবাধিকার সংস্থা— এখানে মানবাধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করার কথা আলোচিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টিও এখানে বলা হয়েছে। ১৭ ও ১৮ নং ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ও তার কার্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

খ) সাম্য, মর্যাদা ও অসহিষ্ণুতা—

১) ১৯ থেকে ২৪ নং ধারায় জাতিবিদ্বেষ, বৈষম্য সহ নানা ধরনের অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২) ২৫ থেকে ২৭ নম্বর ধারায় জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার;
২৮ থেকে ৩২ নম্বর ধারায় ভূমিপুত্রদের অধিকার;
৩৩ থেকে ৩৫ ধারায় পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩) ৩৬ থেকে ৪৪ ধারায় নারীর মানবাধিকার ও সমান মর্যাদার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৪) ৪৫ থেকে ৫৩ ধারায় শিশুদের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

৫) ৫৪ থেকে ৬১ নং ধারায় নির্যাতন থেকে মুক্তির বিষয় আলোচনা স্থান পেয়েছে।
৬২ নং ধারায় সকল ব্যক্তিকে বলপূর্বক অন্তর্ধান (enforced disappearance) থেকে রক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) ৬৩ থেকে ৬৫ নম্বর ধারায় বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

গ) ৬৬ নং থেকে ৭৭ নং ধারা— সহযোগিতা, উন্নয়ন ও মানবাধিকার— এখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ) ৭৮ থেকে ৮২ নং ধারায় মানবাধিকার শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে।

ঙ) ৮৩ থেকে ৯৮ নং ধারায় মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও তদারকির পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

চ) ৯৯ থেকে ১০০ নম্বর ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সম্পর্কিত সকল সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গোটা মানবজাতের চেতনা যাতে আরও বেশি জাগ্রত হয় এবং গোটা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের সফল প্রয়োগ ও প্রসার ঘটে এবং মানবাধিকারের যাতে সর্বজনীনভাবে কার্যকরী প্রয়োগ হয়, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

VDPA বা ভিয়েনা ঘোষণা (১৯৯৩)-কে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরে ভিয়েনা ঘোষণা বা VDPA (1993)-র মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ মানবাধিকার রক্ষা বা প্রসারকে আরও গুরুত্ব দিয়ে তার প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া শুরু করে। জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮)-কে আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়।

বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে VDPA আর্থিক অনুদান বাড়ানোর ক্ষেত্রে জোর দিতে বলায়, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং গণ সচেতনতা এবং পুর সমাজের গণ অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়।

VDPA সন্ত্রাসবাদ রোধ করার উদ্দেশ্যে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মধ্যে এক প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করেছে। VDPA বার বার গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। আফগানিস্তানে তালিবানি জঙ্গিদের হাতে আক্রান্ত ইউসুফ মালায়লাকে পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের অবসান এবং জঙ্গি অধ্যুষিত উপদ্রুত আফগানিস্তান, পাকিস্তানে মানবাধিকার প্রসারের অন্যতম প্রচারক বা প্রতিনিধি হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাঁকে দেখে মানবাধিকারের প্রসার আরও সুগম হয়।

শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্র্য দূরীকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, মায়ানমারের মতন স্থানে শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন আর্থিক অনুদানের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়নের অধিকার বা Right to Development-এর উপর VDPA বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর পাশাপাশি বর্ণবিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, বিদেশাতঙ্ক দূর করার উদ্দেশ্যে VDPA নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ধর্ম, ভাষা বা জাতি অর্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। মহিলাদের অধিকার রক্ষা, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে VDPA-র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণও VDPA-র অন্যতম কর্মসূচি।

সামগ্রিকভাবে, ভিয়েনা ঘোষণা (VDPA) বলছে, সমস্ত মানবাধিকারের সর্বজনীন ধরন এবং মৌলিক স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত। সমস্ত মানবাধিকার হল সর্বজনীন, অবিভাজ্য, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল বা পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই সম্মেলন মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা সদর্থক পদক্ষেপ সুপারিশ করেছে যাতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ আরও বেশি শক্তিশালী হয়। এমনকী এই গোটা প্রক্রিয়া যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার রক্ষার অর্থে হাই কমিশনার পদটি নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয় সাধারণ সভার অধিবেশনে, যার ফলে ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর এই পদটির সৃষ্টি হয়।

করোনা মহামারির জেরে গোটা বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষা একটি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। তবে আশা রাখা যায়, দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং নানাবিধ কারণে গোটা বিশ্বের নানা প্রান্তে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি কেউ চাইবে না। তাই গোটা বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার কাজে গোটা মানবজাতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। আর সেই সচেতনতা থেকেই মানবজাতের মানবাধিকার সংরক্ষণ বাস্তবে পরিণত হবে।

তবে ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা ঘোষণা মানবাধিকারের সফল সার্বিক প্রয়োগের উপর যে জোর দিয়েছিল, সেই উদ্যোগ এবং কর্মসূচি যাতে বিফলে না যায়, তা দেখার দায়িত্ব গোটা মানবজাতের। তাই সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবে প্রয়োগ করলেই মানবাধিকার রক্ষা, সংরক্ষণের কর্মসূচি সফল হবে।